ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-v, May, 2025, Page No. 1230-1238
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.125

কৈলাসবাসিনী দেবীর 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী': প্রসঙ্গ ঊনবিংশ শতকের 'নতুন' পরিবারভাবনা

সৌমী বসু, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.05.2025; Accepted: 14.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article attempts to explore the 'new' family-view and the inner quarters of an enlightened Hindu household in 19th century Bengal through the autobiographical narrative of Kailashbasini Devi (1829-1995). Kailashbasini was the wife of Kishori Chand Mitra (1822-1873), a writer, social reformer and civil servant in colonial Bengal, who was educated at Hindu College. His brother was the renowned novelist Peary Chand Mitra. By examining Kailashbasini Devi's autobiography, we delve into the domestics and conjugal lives of Kishori Chand and Kailashbasini, revealing the ethos of their family and the evolving 'new' family perspective of a western-educated young man. We analyze her narrative in the context of social history to understand why this memoir has become an essential document for studying the emergence of 'new' family-thoughts in 19th century Bengal.

Keywords: Nineteenth Century, Colonial Bengal, Hindu Household, Western-Educated Enlightened Man, 'New' Family-thoughts, Inner World of Family, Memoir of Women, Social History.

বর্তমান প্রবন্ধের মূল অভিমুখ কৈলাসবাসিনী দেবীর (১৮২৯-১৮৯৫) আত্মকথার প্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতকের বঙ্গদেশ, তৎকালীন সমাজ, নারী ও সমকালীন সময়ের পরিবারভাবনাকে অনুধাবন করার চেষ্টা। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা বুঝে নিতে চেষ্টা করবো কেমন ছিল কৈলাসবাসিনীর জীবন! দেখবো উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের নিয়ে সমাজপতিদের চিন্তাভাবনার পাশাপাশি তিনি নিজে কী ভাবে দেখছেন ক্রম বিবর্তিত সময়, সমাজকে। ঠিক কী ভাবছেন নিজেকে নিয়ে বা আদৌ কিছু ভাবছেন কি না! সময়ের উপকরণ হিসাবে চিহ্নিত আমাদের নির্বাচিত কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথা, কী ভাবে সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতকের 'নতুন' পরিবারভাবনাকে বুঝতে অপরিহার্য অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে, তা পর্যালোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কৈলাসবাসিনীর জন্ম সম্ভবত ১৮২৯-এ। স্থান রাজপুর। পিতা গোরাচাঁদ ঘোষ। দেশাচার মেনে মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় প্রসিদ্ধ বাগ্মী, লেখক, সমাজ সংস্কারক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে। কিশোরীচাঁদের জন্ম ১৮২২-এর ২২ মে। পিতা রামনারায়ণ মিত্র; ছিলেন পরিশ্রমী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন এবং রামমোহন রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মাতা আনন্দময়ী ও অগ্রজ সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র। বাল্যকালে হেয়ার স্কুল ও তৎপরবর্তীতে হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ কিশোরীচাঁদের মনকে করেছিল যুক্তিবাদী ও প্রসারিত। ডিরোজিওর ছাত্রবন্ধু অগ্রজ প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁর সতীর্থ-সহপাঠী রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দে, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ 'ইয়ংবেঙ্গল'এর সান্নিধ্য কিশোরীচাঁদের মননকে গঠন করতে সহায়কের ভূমিকা

নিয়েছিল।[১] ১৮৩৫-এ ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ও মেকলে মিনিটের ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে তৈরি হওয়া একদল নব্য শিক্ষিত যুবক যাঁরা ইংরেজি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে নবভাবনা ও নবচেতনার আলোকে বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্ককে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে তৎপর হয়েছিলেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র ছিলেন তাঁদেরই একজন এবং সেই পথ ধরেই কৈলাসবাসিনী দেবীর 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী'তে এক নারীর ভাষ্যে ব্যক্ত হয়েছে সমকালের প্রেক্ষিতে নারী-পুনর্গঠনের ইতিহাসও। প্রকাশিত হয়েছে চেতনার আলোকপ্রাপ্ত এক মহিলা কী ভাবে দেখছেন সমাজ, পরিবার ও 'আত্ম'কে!

কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথাটি 'গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' শীর্ষকে ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের প্রথমেই। এর প্রায় ঊনত্রিশ বছর পরে ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'এক্ষণ' পত্রিকায় 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' নামে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ডায়েরীর সূচনা হয়েছে ১২৫৩ সালের আষাঢ় মাস থেকে এবং শুরুতেই কৈলাসবাসিনী তাঁর সদ্যজাত পুত্রের মৃত্যুর খবর জানিয়ে বলেছেন পৌত্র হারিয়ে কীভাবে তাঁর শাশুড়ি ঠাকুরানী এবং পুত্র হারিয়ে তাঁর স্বামী বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্বামীর অগ্রজ শ্যামচাঁদ মিত্র; যিনি ষোল বছর বয়সে গতাসু হন তাঁর কথাও উল্লেখ করেছেন। কৈলাসবাসিনীর ডায়েরীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হোল সাল-তারিখ এবং সময়ের উল্লেখ। এছাড়াও সমান্তরালে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী, যেমন নবাব সাহেবের মাতার এন্তেকাল, সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা বিলাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু প্রভৃতির উল্লেখ দেখা গেছে তাঁর ডায়েরীতে। উনিশ শতকের অন্তঃপুরিকা কৈলাসবাসিনীর জীবন যে কেবল অন্তঃপুরকেন্দ্রিক ছিল না বা তাঁর জানার-ভাবার-খোঁজ রাখার পরিধি যে কেবল 'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার' অবধি ছিল না,তা বোঝা যায় উক্ত বিষয়গুলি থেকে।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর সময় কৈলাসবাসিনী ছিলেন গর্ভবতী। গর্ভাবস্থায় বাড়িতে তাঁর প্রতি নেওয়া যত্ন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

> '...আমি বাটিতে রহিলাম চৈত্র মাসে আমার সাদ হল। আমার জারা সাদ দিলেন। আমি সবার ছোটো আমার আদর সবার কাচে।'[২]

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের সমাজে; যখন ধর্ম ও পরিবার কল্যাণের নামে দেশাচার বজায় রাখতে হিন্দু পরিবারের নারীকে জীবিতাবস্থায় সহমরণে-অনুমরণে পাঠানো ছিল স্বাভাবিক ঘটনাবলী, যখন কৌলীন্যপ্রথার ফলাফলে স্বামীর বহুবিবাহ নারীর জীবনকে করে তুলেছিল যন্ত্রনাদীর্ণ, সে সময় দাঁড়িয়ে হিন্দু পরিবারের কোন বধূ যখন শ্বশুরগৃহে নিজের প্রতি পরিবারবর্গের নেওয়া আদর-যত্নের উল্লেখ করেন তখন একবিংশ শতকের পাঠক হিসাবে আমাদের অত্যন্ত ভালো লাগে বইকি এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই পাশাপাশি স্মরণে আসে সারদাসুন্দরী দেবীর কথা; কেশব জননী সারদাসুন্দরী তাঁর আত্মকথায় প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে এসে তাঁর ভীত-ত্রস্ত দৈনন্দিন জীবনের কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়।[৩] সারদাসুন্দরীর জন্ম ১৮১৯ সালে এবং দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। অপরদিকে কৈলাসবাসিনীর জন্ম ১৮২৯-এ। তাঁর বিবাহ হয় এগারো বছর বয়সে। অর্থাৎ প্রায় দশ বছরের তফাতেই যে কোন-কোন হিন্দু পরিবারের অন্দরমহলে এমন কিছু-কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছিল তা কিন্তু লক্ষ্যণীয়! সেকালের কলকাতার বিখ্যাত ধনী সমাজপতি দেওয়ান রামকমল সেনের বধূমাতা সারদাসুন্দরীর আত্মকথায় তাঁর শাশুড়ি ঠাকুরানীর বধূর প্রতি অকারণ আক্রোশের কিছু নমুনা মিললেও কৈলাসবাসিনীর আত্মকথায় কিন্তু তাঁর শিক্ষিত[৪] শাশুড়িমাতার তরফে এমন কো ন আচরণের উল্লেখ মেলেনি যদিও শিশু পুত্রের মৃত্যুর পর যদিও কৈলাসবাসিনীর দ্বিতীয় সন্তান কন্যা ভূমিষ্ঠ হলে তিনি দুঃখিত হয়ে বলে উঠেছিলেন, 'সোনা হারিয়ে কাঁচ পাইলাম।'[৫] স্পষ্টত বোঝা যায়, এটি পুরুষতান্ত্রিক ভাবনারই কণ্ঠস্বর। যে ভাবনার ফলাফলে পরিবারের উত্তরাধিকারী হিসাবে কেবল পুরুষেরা নয়, পরিবারের মহিলাদেরও প্রার্থিত থেকেছে পুত্রসন্তান। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় আসলে তার পরবর্তী বাক্যটি! কৈলাসবাসিনী লিখছেন,

> 'আমার স্বামি বড় আহ্লাদিত হইলেন। চিটি নিকিলেন তোমার একটি কন্যা হইয়াচে সুনে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বর্ণনা জায় না। শ্রীশ্রীজগদিশ্বরের ইচ্ছাতে তুমি ভালো য়াছ ও

আমার কন্যাটি ভালো আচে শুনে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। তুমি মনে কিছু দুঃখিত হও না। শ্রীশ্রীজগতপতির কাচে সব সমান। আমাদের কাচে সব সমান ভাবা উচিত।'[৬]

এই বয়ান ছিল উনিশ শতকের নব্য শিক্ষিত যুবকের বয়ান যাঁর কাছে বিবাহ-দাম্পত্য-সন্তান কেবলমাত্র ধর্মানুসারে শাস্ত্র নির্দেশিত ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং দাম্পত্য সম্পর্ককে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল এই সময় থেকে।

গবেষক বিনয় ঘোষ উনিশ শতকের বঙ্গদেশে ইয়ংবেঙ্গলের 'বিদ্রোহ'-এর কারণ হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যের অসঙ্গতিকেই চিহ্নিত করেছেন। পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তরুণ দল তাঁদের মানসলোকে যে নতুন সমাজ ও পরিবারের ছবিকে নির্মাণ করছিলেন তা বঙ্গদেশের আবহমান কাল ধরে চলে আসা পুরাতন অনুদার ঐতিহ্যবাহী রূপ নয়, বরং তা ছিল বিশ্বজনীন ও ব্যক্তিকৃতিমুখী।[৭] কিশোরীচাঁদ মিত্র ছিলেন হিন্দু স্কুলের ছাত্র ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁর মানসিক উন্নতিবিধান হয়েছিল স্বয়ং ডেভিড হেয়ার ও ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের প্রযত্নে, অগ্রজ প্যারীচাঁদ তথা ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সাহচর্য তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত প্রমুখেরা। এহেন কিশোরীচাঁদের মানসিক গড়ন যে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির হবে তা বলাই বাহুল্য। নব্য শিক্ষিত যুববৃন্দ বঙ্গদেশে আবহমান কাল ধরে চলে আসা দেশীয় কাঠামোর বিপরীতে যে একটা 'নতুন' পরিবারভাবনাকে নির্মাণ করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন এবং এই নতুন পরিবারভাবনার কেন্দ্রে ছিল নারী ও নারীর পুনর্গঠন। অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে বের করে নারীকে আলোর সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা। তাকে 'গড়ে তোলা' নিজের 'যোগ্য' সহধর্মিণী হিসাবে। তাঁরা চাইছিলেন এই নবভাবনায় নির্মিত পরিবারগুলো কেবল আর কর্তব্য ও নৈতিকতার বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে না, বরং পরিবারই হয়ে উঠবে জীবন বিকাশের আধার। আত্মকথায় কৈলাসবাসিনী লিখছেন ১২৫৪ সনের ৭ই বৈশাখ তাঁর কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, অনেকেই পরবর্তী পুত্রসন্তান হওয়ার ঈঙ্গিত দেন অথচ কিশোরীচাঁদ আর কৈলাসবাসিনী সারাজীবন একমাত্র কন্যা সন্তান কুমুদিনীর পিতা-মাতা হয়েই থেকে গেলেন। কিশোরীচাঁদের ছেলের সখের কথা কৈলাসবাসিনী নিজে লিখলেও পুত্রসন্তানের আশায় তৃতীয়বার গর্ভধারণ করতে বাধ্য হননি কৈলাসবাসিনী। বরং দেখা যায় তাঁরা প্রতীক্ষা করেছেন এবং পরবর্তীকালে কন্যা কুমুদিনীর পুত্রসন্তান হলে সেই দৌহিত্রকে সোহাগে জড়িয়ে পুত্রসন্তানের শূণ্যস্থান পূরণ করেছেন এই দম্পতি। এপ্রসঙ্গে মনে আসে বাংলা ভাষার প্রথম আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দাসীর কথা; যিনি তাঁর জীবনের আঠেরো থেকে একচল্লিশ দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে পৌনঃপুনিক ভাবে কেবল সন্তানের জন্মই দিয়ে যেতে বাধ্য থেকেছেন। 'আমার জীবন'-এ তাঁর মাতৃত্বকালীন এই পর্ব, যা সম্পর্কে রাসসুন্দরী লেখেন,

'...ইহার মধ্যে ঐ ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়েছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না...'[৮]

এই বাক্যের গূঢ়ার্থ ও অন্তর্নিহিত দীর্ঘশ্বাস সংবেদী পাঠককে মনস্তাপই দেয়।

কন্যা সন্তানের প্রতি অসীম যত্ন ও পুত্র সন্তানের জন্য আকুতির পাশাপাশি কৈলাসবাসিনী ডায়েরী প্রকাশ করেছে উনিশ শতকের পরিবারগুলির অস্বাস্থ্যকর সূতিকাঘরের চিত্র। পারিবারিক বিত্তসম্পদের প্রাচুর্য যে সূতিকাঘরের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার বদল ঘটাতো না, তা প্রকাশ পেয়েছে কৈলাসবাসিনীর প্রতি ছত্রে...

'আমাদের জে শূতিকাগার তাহা এক প্রকার গারোদ ঘর। জদিও আমি বড় নকের কন্যা, বড় নকের বৈউ, বড় নকের স্ত্রী তথাপি সেই সামান্য নকের মতন থাকিতে হইবে। নামোর ঘর জল উঠিতেছে, তার উপর দরমা মাদুর কম্বল পাড়া একটি বালিস এই বিচানার সঙ্গে। খাওয়া ঝাল ও চিঁড়া ভাজা। ধোপা নাপিত বন্দ। পোয়াতির এই দুরাবোস্থা। ও দিকে দাই নাপিত বাজোনদার হিঝিরে অবাবিরদার। কিন্তু পআতিকে জে বিছেনা দিলে ফেলা জাবে সেইটে বড় বাজে খরচ।'[৯]

গর্ভাবস্থায় যে বধূ পরিবারের কাছে আদরযত্ন পেয়েছেন, সূতিকাঘরের প্রসঙ্গে তাঁরই লেখায় উল্লিখিত এই 'বাজে খরচ' শব্দদ্বয়ের অভিঘাত কিন্তু আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। আমরা বুঝতে পারি কৈলাসবাসিনীর তাঁর জা-শাশুড়িমাতা সকলের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভালবাসা, যত্ন একদিকে আর পরিবারের অর্থনৈতিক খরচের হিসাব একদিকে! তখনো নারী স্বয়ং অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জায়গায় উপনীত হয়নি, তাঁর হাতে পরিবারের অর্থনৈতিক ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারও আসেনি। ফলাফলে পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যিনি করতেন, অর্থাৎ পরিবারের 'কর্তা', যিনি অবশ্যম্ভাবী ভাবে পুরুষও বটে, তাঁর ভাবনায় সূতিকাঘরের শয্যাসামগ্রীর জন্য খরচ অপচয়ই বটে। কেননা সেই শয্যাসামগ্রীর তো আর পরবর্তী ব্যবহৃত নেই! আমরা বুঝতে পারি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা, যা পরবর্তী উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বঙ্গের নব্য পরিবারভাবনায় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিচার্য হবে, তখনো অবধি সে বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ শুরু হয়নি। অন্তঃপুর ও আঁতুড়ঘরের অপরিচ্ছন্নতার প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণালের পত্রে উল্লিখিত সাহেব ডাক্তারের বাড়ির অন্দর দেখে আশ্চর্য হওয়া এবং আঁতুড়ঘর দেখে বকাবকির ঘটনা। কিশোরীচাঁদ মিত্রের পরিবারে প্রসূতি নারীকে ইংরেজ ডাক্তার দেখানোর উল্লেখ মেলে নি বটে, কিন্তু প্রবাসী স্বামীর কর্মস্থল রামপুরে গিয়ে অসুস্থ কৈলাসবাসিনী যে ইংরেজ ডাক্তার বেডফোট সাহেব, নেলর সাহেব প্রমুখের কাছে চিকিৎসা করিয়াছেন তার উল্লেখ মেলে আত্মকথায়। আমরা বলতে পারি, প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে সূতিকাঘরের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়ার আবশ্যকতা, এই সচেতনতা কৈলাসবাসিনীর বিজ্ঞানসম্মত চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ; যা উনিশ শতকের বেশিরভাগ নারীর তথা পরিবারগুলিতে তখনো তৈরি হয়নি। এখানেই কৈলাসবাসিনী আলাদা হয়ে যান। স্বামী কিশোরীচাঁদের তত্ত্বাবধানে তিনি কেবল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না হননি, বরং শিক্ষার আলোকে তিনি ধারণ করেছিলেন এবং দৈনন্দিন জীবনে সেই শিক্ষার প্রয়োগ বিষয়েও তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন আর এই সচেতনতার বোধই কৈলাসবাসিনীকে স্বতন্ত্র করে দেয় ঊনবিংশ শতকের অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে।

সম্পূর্ণ ডায়েরীজুড়ে প্রকাশ পেয়েছে কিশোরীচাঁদের সঙ্গে কৈলাসবাসিনীর গড়ে ওঠা এক অপূর্ব দাম্পত্যের ছবি। কন্যা হওয়ার সংবাদ পেয়ে কিশোরীচাঁদ চিঠি দেন এবং অপেক্ষা করেন স্ত্রীর কাছ থেকে উত্তরের। কিন্তু সূতিকাঘরের 'গারোদে' অবরুদ্ধ কৈলাসবাসিনীর পক্ষে তা সম্ভব হয়ে না উঠলে কিশোরীচাঁদ লেখেন,

> '...তুমি কি নিষ্ঠুর তুমি কি নির্দয়, আমি কেলেস পেলে তুমি য়েতো শুকি হও তাহা আমি এতোদিন জানিতাম না। তোমাকে আমি ফি চিটিতে অনুরোদ করি এক নাইন নিকিতে তাহা তুমি নেকো না। কিন্তু আমি আর তোমাকে চিটি নিকিবো না। আমি বড় ভাবিত হইলাম, জদি দুই কি তিন দিন চিটি না নেকেন তা হলে মরে জাবো। কি করি সুতিকা পুজোর দোত ও কলম ছেলো তাইতে নিকিলাম।'[১০]

প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর জন্য প্রবাসী স্বামীর এই উচাটন, এই অভিমানাহত স্বর, স্বামী-স্ত্রীর এইভাবে একে-অন্যের সঙ্গে লগ্ন থাকা বঙ্গদেশের দাম্পত্য জীবনে ছিল নতুন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, নতুন শিক্ষা ও ভাবনায় শিক্ষিত-উদ্বুদ্ধ নব্যযুবকদের কাছে বিবাহ আর কেবল শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য বা দেশাচার পালনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বিবাহ সম্পর্কের নতুন বয়ান উনিশ শতকে তৈরি হচ্ছিল তাঁদের হাতে। আর তাই স্ত্রীর কাছে কিশোরীচাঁদের চিঠিতে প্রকাশিত পুরুষকণ্ঠ 'স্বামীপ্রভুর' ভাষা নয়, বরং বলা যায় এই ভাষা সেই প্রেমিকের যে একাধারে স্বামীও। রাসসুন্দরী তাঁর আত্মকথায় 'যে লোকের অধীনী হইয়া একাল পর্যন্ত দিবস গত' করার চিত্র প্রকাশ করেছিলেন, তার থেকে কিশোরীচাঁদের ছবি ছিল সম্পূর্ণত বিপরীতধর্মী। বড় অল্প সময়ের হলেও দাম্পত্যের মাধুর্য্যমাখা ছবি কেশজননী সারদাসুন্দরীর আত্মকথাতেও মেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারদাসুন্দরীর স্বামী দেওয়ান রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনও ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র।

'স্বাধীনতা' বা 'মুক্তি'র আস্বাদ উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি অন্তঃপুরিকাদের যাপনচিত্রে একেবারে অচেনাই। ইউরোপীয় শিক্ষার সঙ্গে পরিচিতিকরণের ফলাফলে নব্যশিক্ষিত যুবকদল অন্দরের সঙ্গে বাহিরকে

পরিচিত করার চেষ্টা করেন, স্বাধীনতার বৃহত্তর অর্থ তখনো অধরা ছিল মেয়েদের কাছে। কৈলাসবাসিনীর ডায়েরী থেকে আমরা লক্ষ্য করি তিনি কিন্তু 'স্বাধীনতা' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন একাধিকবার। তাঁর উল্লিখিত এই 'স্বাধীনতা'র স্বরূপের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তাহলে দেখবো, তা ছিল অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাওয়ার এবং বাইরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করার অধিকার। 'শব্বোদা আমোদ আহ্লাদে' থাকা কৈলাসবাসিনী তাই সুখী ছিলেন, তুষ্ট ছিলেন। স্বামীর কর্মস্থলে গিয়ে বাস করা কৈলাসবাসিনীর জীবন ছিল তাঁর নিজের কাছে 'স্বাধীন'; যদিও কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর স্ত্রীকে কেবল নীলমণি বসাক ও ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাসা ভিন্ন আর কোথাও পাঠাতেন না। অর্থাৎ, অন্তঃপুর থেকে বাহিরপথে পদ সঞ্চালনার ক্ষেত্র ছিল সীমিত এবং কতখানি যাওয়া হবে তাও ছিল নিয়ন্ত্রিত কিন্তু 'অই স্বাধীনতায় তুষ্ট' ছিলেন কৈলাসবাসিনী। কেননা, নিজের মতো করে এইটুকু জীবনও তখন অন্তঃপুরিকাদের ছিল কই! পাথুরিয়াঘাটার মোহিতকুমারীর স্মৃতিকথায় দেখি বাড়ির উঠোন দেখার অধিকারটুকুও তাঁর ছিল না। সেটুকু যেদিন তিনি দেখতে পেতেন সেটাই তাঁর কাছে হয়ে উঠতো কিছু পরম পাওয়া। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে কৈলাসবাসিনী 'স্বাধীন' ছিলেন বইকি! কিশোরীচাঁদের কর্মস্থলের অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তিবর্গের স্ত্রীদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ইচ্ছে হলে কখনো নদীতে স্নান করতে যাওয়া, মেমসাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, স্বামীর সঙ্গে নৌকাবিহার, তাস খেলা... এমন জীবনের সঙ্গে দেখা তো তৎকালীন সব মেয়ের হয়নি।

উনিশ শতকের মেয়েদের জীবনে তীর্থযাত্রা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসলে মনযোগী পাঠে বোঝা যায় যে এই যাত্রাগুলিই রক্ষণশীল পরিবারের 'পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী'সম নারীদের কাছে ছিল একফালি মুক্ত আকাশ। উনিশ শতকের নারীমুক্তি বা নারীপ্রগতির পথে নারীর দেশ-বিদেশ ভ্রমণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল; যা শুরু হয়েছিল ১৮৬৯-৭০ থেকে। কিন্তু তার আগে শ্বশুরগৃহ থেকে পিত্রালয় গমণ বা আত্মীয়বাড়ি ভ্রমণ, গঙ্গাস্নানে যাওয়া, মন্দির দর্শন মূলত এগুলোই ছিল নারীর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিতিকরণের একটুকরো অবকাশ। কিন্তু এই তীর্থযাত্রাও নেহাত সহজসাধ্য ছিল না সেকালের মেয়েদের কাছে কেননা পরিবারতন্ত্রের গোঁড়ামি, নারীর সামগ্রিক পরাধীনতা ও আর্থিকভাবে শ্বশুরকূলের উপর নির্ভরতা সে পথকেও যে সর্বদা সুগম করেনি তার বাস্তবচিত্র দেখা গেছে কেশবজননী সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথায়। কিন্তু কৈলাসবাসিনীর ক্ষেত্রে এধরণের পারিবারিক বিপত্তি আসেনি বরং তাঁর শাশুড়িমা নিজেই তাঁকে কাশী নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেন। পারিবারিক ভাবে এমন তীর্থস্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কৈলাসবাসিনীর পূর্বেও হয়েছিল। তাঁর নিজের বয়ানে...

> 'এইবার দেকিতে দেকিতে জাচ্চি। আর প্রথমবার শাশুড়ি রাকিতে গেচেলেন, তাহাতেও দেকেচিলুম। কিন্তু তাতে দুই ভাশুর শঙ্গে ছেলেন, আর পুত্র শোক শঙ্গে ছেল, এই কারণ ভাল করে দেকি নাই। এবারে মনের শাধে দেখিলাম...।'(১১)

বাড়ির অধিকাংশ নারীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় কৈলাসবাসিনীর ডায়েরী জুড়ে ব্যক্ত হয়েছে নির্মল আমোদ-আহ্লাদ। স্বামীর সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানো কৈলাসবাসিনীর জীবন ছিল সুমধুর। তাঁর কণ্ঠে বেদনা ধ্বনিত হয়েছে তখনই, যখন তিনি স্বামীকে কাছে পেতেন না। কাজের সূত্রে কিশোরীচাঁদ মফস্বলে গেলে কৈলাসবাসিনী 'রবিনশেন কুরূষের মতন' থাকতেন...

> 'খেতুম শুতুম বই পড়তাম শিল্প কর্ম্ম করিতাম। আমার কন্যাকে শেকাতেম, আর এই বই নিকিতেম। আর কবে আশিবেন দিন গুনিতাম। য়েলে জেন বাচিতাম।'(১২)

কৈলাসবাসিনীর আত্মকথার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল, সেকালের একাধিক খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছেন কোন না কোন পৃষ্ঠায়; যেমন- প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দে, নীলমণি বসাক, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। কিশোরীচাঁদ মিত্রের মায়ের যে টুকরো-টুকরো ছবি প্রকাশ পেয়েছে তিনি এমন মায়ের মতো বলেই মনে হয়েছে যিনি কন্যা ও বধূমাতাকে সম স্নেহ ও সম্মান দেন। এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মহিলা সেকালে বিরল বটে! স্বামী ও শ্বশুরবাড়িতে বধূর এই

আদর-যত্ন-সম্মান কৈলাসবাসিনীকে একদিকে যেমন করেছে গরবিনী এবং অপরদিকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে করেছে মজবুত ও 'আত্ম'বোধকে করেছে প্রখর।

কিশোরীচাঁদ ও কৈলাসবাসিনীর দাম্পত্যের ছবিই এই ডায়েরীর অন্যতম সুমধুর বিষয়। কৈলাসবাসিনীর ব্যক্ত নানাবিধ ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে থাকতে কীভাবে অপারগ ছিলেন! কিশোরীচাঁদের কর্মস্থলেই মূলত থাকতেন তাঁর স্ত্রী। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর যাওয়া ছিল উৎসব-অনুষ্ঠান-লৌকিকতা পালনে। প্যারীচাঁদের বড় মেয়ের বিবাহে কৈলাসবাসিনীর যাওয়া নিয়ে তিনি যে ঘটনাবলীর উল্লেখ তিনি ডায়েরিতে করেছেন তা কিশোরীচাঁদের একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমেরই নিদর্শন বলা চলে। এমন করে সযতনে সসম্মানে সেকালে স্ত্রীকে খুব অল্প পুরুষই রেখেছিলেন। পাশাপাশি মনে পড়বে 'আমার জীবন'-এ রাসসুন্দরীর সন্তাপ। স্বামীর ও পরিবারের অসুবিধা হবে বলে তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী মা কে দেখতে অবধি যেতে পারেননি তিনি। নিত্যদিনের সুবিধায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা হবে বলে তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি। কী অপার বেদনায় ভরে উঠেছে রাসসুন্দরীর কলম একথা বলতে গিয়ে। অথচ এমন নয় যে রামদিয়া গ্রামের সরকার পরিবার কিছু কম বিত্তবান ছিল, এমনও নয় যে অন্দরমহলের জন্য পরিচারিকা নিয়োগ করা যেত না! বাহিরমহলে জনা বিশের বেশি পরিচারক থাকলেও অন্দরমহল পরিচারিকাশূণ্য থেকেছে অথচ সারাদিন একাহাতে কী পাহাড়প্রমাণ পরিশ্রম রাসসুন্দরীকে করতে হোত, তার সবিশেষ তথ্য মেলে 'আমার জীবন'-এ। দাম্পত্য নিয়ে রাসসুন্দরীর মিত উচ্চারণ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে 'লজ্জাশীলতা' মনে হলেও আমাদের তা মনে হয় না। বরং মনে হয় 'বলার মতো' আদৌ কিছু ছিল কি; যা যুগ যুগ ধরে চলে আসা হিন্দু সমাজে স্বামী-স্ত্রীর ছবি থেকে আলাদা কিছু? আমাদের মনে হয়েছে, নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্কে কিছু গতানুগতিক কথা বলার কোন উৎসাহ রাসসুন্দরী অনুভব করেন নি। আলাদা কিছু বলার মতো হলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, যেমন বলেছেন অন্যান্য কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা; যিনি বিলাতে বসে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে রাশি-রাশি চিঠিতে নারীপুরুষের দাম্পত্যের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আলোকিত করেছেন। বোঝানোর চেষ্টা করছেন, কীভাবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠা সম্ভব। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি দাম্পত্য সম্পর্কে যৌথতার একটা নতুন বয়ান নব্যশিক্ষিত যুবাদের হাত ধরেই বঙ্গীয় সমাজে ক্রমশ তৈরি হতে শুরু করেছিল।

কিশোরীচাঁদ যথার্থ অর্থেই পত্নীকে সহধর্মিনীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন কৈলাসবাসিনীকে 'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষায়' সর্বদিক থেকে পারদর্শী করে তুলতে। নিজে শেখাতেন ইংরেজি, মিস টুগোড সাপ্তাহিকভাবে এসে শেখাতেন লেখাপড়া ও সেলাই, এছাড়াও ঘরের গুরুর কাছেও হোত লেখাপড়া। সংবাদ প্রভাকর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নিত্য পাঠিকা ছিলেন তিনি। কিশোরীচাঁদের সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানোর ফলে নিত্যনতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ তো চলতই। প্রতিনিয়ত ভিতর থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠা কৈলাসবাসিনী তাই হয়ে উঠেছিলেন উনিশ শতকের নারীদের সাপেক্ষে এক অনবদ্য বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। তখন সমাজ ছিল মূলত একান্নবর্তী পরিবারের আওতাভুক্ত। সেই সময় শ্বশুরবাড়ি ব্যাতিরেকে বধূ স্বামীর কর্মস্থলে বাস করবে পরিবারের তরফে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট প্রগতিশীল; কেননা সময়কাল তখন ১২৫৩বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজির ১৮৪৬-৪৭ সাল। দীর্ঘদিন নানা স্থানে বদলি হওয়ার পর অবশেষে কিশোরীচাঁদ যখন কলকাতায় বদলি হয়ে এলেন তখন বঙ্গাব্দের হিসাবে ১২৬১ সালের আষাঢ় মাস তথা ইংরেজির ১৮৫৪। পৈতৃক বাড়িতে দিন পনের থাকার পরে কিশোরীচাঁদ চিৎপুরে গঙ্গার ধারে বাসা বাড়ি ভাড়া করেন মাসিক ৯০টাকা ভাড়ায় এবং স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে সেখানে চলে আসেন। কলকাতায় অবস্থান করেও একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে একক পরিবার তৈরির সিদ্ধান্তে পারিবারিক মনান্তরের কোন খবর কৈলাসবাসিনীর ডায়েরীতে মেলে না। ব্রাহ্মরা একান্নবর্তী পরিবার থেকে সরে একক পরিবার শুরু করেন ১৮৬০-৭০এর দশকে (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী জোড়াসাঁকোর একান্নবর্তী পরিবার থেকে দূরে গিয়ে একক পরিবারে থাকা শুরু করছেন ১৮৬৪তে) অথচ কিশোরীচাঁদ মিত্ররা পারিবারিকভাবে ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিন্তু তথ্য বলছে তিনি একক পরিবার গঠন করেছেন ব্রাহ্মদেরও খানিকটা আগে। এই ঘটনাগুলি আসলে বঙ্গদেশের যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

বিকাশ ও 'নতুন' পরিবারভাবনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত; যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি প্রকৃষ্ট রূপ ধারণ করেছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম নব্য শিক্ষিত তরুণ দল যে পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে চাইছিলেন তা এতদিনকার ঐতিহ্যিক সমাজ ও পরিবার কাঠামো থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। কৈলাসবাসিনী ও কিশোরীচাঁদের পরিবার সেই নব পরিবারভাবনারই নির্মিতি বলে আমাদের মনে হয়।

একক পরিবারে অবস্থান করলেও আমরা তাঁর সংসারের অন্দরমহলের যে ছবি পাই তাতে দেখি রান্নার জন্য আছে ব্রাহ্মণ পাচক যদিও কিশোরীচাঁদ সব ধরণের খাবারই খান, এমনকি সাহেবদের সঙ্গে একত্রে বসেও তিনি আহার করেন। তবে কৈলাসবাসিনী পুরুষভৃত্যদের সামনে বের হন না, দিনে কোথাও গেলে পাল্কিতেই যাতায়াত করেন। রামগোপাল ঘোষের মা নিমন্ত্রণ করলে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যান ঠিকই কিন্তু অন্নগ্রহণ না করে সাগু খান। সেই নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম সদস্য রামতনু লাহিড়ীর স্ত্রীও এবং বাড়ি ফিরে কৈলাসবাসিনী স্বামীকে তিনি জানান লাহিড়ী বাবু সমস্ত দেশাচার ত্যাগ করেছেন। কৈলাসবাসিনীর আচরণে খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হওয়া সঙ্গত যে তিনি ধর্মীয় নিয়মনীতিতে বিশ্বাসী একারণেই এসব মেনে চলেন। কিন্তু হিন্দুর লোকাচার নিয়ে কৈলাসবাসিনীর মতামত আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। তিনি জানাচ্ছেন,

> 'আমি হিন্দুয়ানি মানিনে, কিন্তু বরাবর খুব হিন্দুআনি করি। তার কারণ আমি যদি একটু আলগা দিই তাহলে আমার স্বামি আর হিন্দুয়ানি রাকিবেন না। হিন্দুরা হলেন আমার পরম আত্মীয়। তাঁদের কোন মতে ছাড়িতে পারিবো না, ইহা ভেবে আমি খুব হিন্দুয়ানি করি। আমার বড় ভয় পাছে আমার হাতে কেউ না খান, তাহলে কি ঘৃণার কথা, তার কর্তে মরণ ভাল। একে তো আমার স্বামি প্রকাশ্যে খান,এতে জদি আমি কিছু করি তা হলে একেবারে চূড়ান্ত।...'[১৩]

কেবল তা নয়, এরপর তিনি বলছেন, কিন্তু তিনি তাঁর এই অন্তরের কথা তাঁর স্বামীকে কখনোই জানাননি। কিশোরীচাঁদ শুনলে খুশি হতেন জেনেও জানাননি কেননা তাহলে বাড়ির ব্রাহ্মণ পাচক আর থাকবে না। কৈলাসবাসিনী বলেছেন, এক মেয়ের মা না হয়ে তাঁর যদি তাঁর স্বামীর ন্যায় চার-পাঁচ জন বিদ্বান পুত্রসন্তান থাকতো তাহলে তিনি তাঁর এই অবিশ্বাসকে নির্দ্বিধায় প্রকট করতে। বিস্মিত হই এই ভেবে এগার বছরের কৈলাসবাসিনী যখন বিবাহ করে কিশোরীচাঁদের কাছে এসেছিলেন তখন থেকেই তাঁর স্বামী তাঁকে সমাজ-সংসার-নিজের যোগ্য গড়ে তুলতে তৎপর ছিলেন। প্রতিনিয়ত তাঁর স্বামীর সেই চেষ্টায় সঙ্গে সঙ্গত করে নিজেকে দীপ্ত করে তুলেছেন। এবং চমৎকৃত হই এই ভেবে যে কতখানি গভীরভাবে সমাজ, সংসার ও পরিবারকে তিনি অনুধাবন করেছিলেন আর তাই-ই ব্যক্ত হয়েছে উপরোক্ত কথাগুলিতে। উনিশ শতকের 'নতুন' পরিবারভাবনার ডিসকোর্সে আমরা এভাবেই লক্ষ্য করি মানুষ নিজেকে ব্যক্তি হিসাবে যে ভাবে দেখছে এবং নিজেকে সমাজের সদস্য হিসাবে যেভাবে দেখছে, পরিবার আসলে তার মধ্যস্থতাই করছে। কৈলাসবাসিনীর বয়ানে সেই চিত্রই পরিস্ফুট হয়েছে আর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা এবং সুগভীর আত্মমর্যাদাবোধের। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী তিনি, বিদ্বান-কর্মবীর স্বামীর সকল সামাজিক সম্মানের অংশীদার তিনি হলেও স্বামীর নিজস্ব বিশ্বাসের ভিতে গড়ে ওঠা জীবনযাপনের ফলস্বরূপ কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তাঁর কন্যা তথা সম্পূর্ণ পরিবারের উপর যাতে না পড়ে সেদিকে তিনি সদা সতর্ক থেকেছেন। সমাজ পরিবর্তনের দিনগুলিতে বাহির ও অন্দরের মধ্যেকার কঠিন লড়াইয়ে অন্তঃপুরিকা নারীর ভূমিকা যে কী, তা স্পষ্ট হয় কৈলাসবাসিনীর বক্তব্যে এবং শুধু তাই নয় স্বয়ং কিশোরীচাঁদও কখনো জানতে পারেন নি কৈলাসবাসিনীর বলা 'তোমার জিবনকে অবিশ্বাস' এই কথার অন্তর্নিহিত দ্যোতনা কতটা সুগভীর! কতখানি দৃঢ়তা থাকলে, কতখানি সুস্পষ্ট জীবনবোধ থাকলে এই বক্তব্য তুলে ধরা যায় তা অনুমেয়। কৈলাসবাসিনীর আত্মবোধের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় কিশোরীলালের চাকুরি জীবনে সংকট এলে। বিনা দোষে তাঁর চাকরি খারিচ হলে কাতর স্বামীকে তিনি যে ভাবে আগলেছেন-সামলেছেন, তা লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, তাঁর স্বামী তাঁকে যে সব শিল্পকর্ম শিখিয়েছেন প্রয়োজনে তার মাধ্যমেও তিনি উপার্জন করতে সক্ষম, তাই কিশোরীচাঁদ যেন কোন দুশ্চিন্তা না করেন। কোথাও এতটুকুও অসুবিধা দুজনের হবে না। অন্তঃপুরিকা গৃহবধূ যিনি

সারাজীবন স্বামীর আদরে-সোহাগে জীবন কাটিয়াছেন, বিত্ত ও সম্ভ্রান্ততার জীবনই যিনি কেবল দেখেছেন এবং তদুপরি উপার্জনশীল নারী তখনও সমাজে অনুপস্থিত, এমতাবস্থায় নিদারুণ অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়িয়ে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলা ও পরিবার প্রতিপালনে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করতে চাওয়া সে সময় নারীর জন্য খুব সাধারণ বিষয় ছিল না। নিজে বিশ্বাস না করেও যে দেশাচার বজায় রেখে তিনি নিজের ও পরিবারের সম্মানে আঘাত আসতে দেবেন না সংকল্প নিয়েছিলেন, পরিবারের বিপাকে সেই দেশাচারকে সরিয়ে উপার্জনশীল হয়ে ওঠার মতো ব্যক্তিত্বও রাখতেন কৈলাসবাসিনী। আর তাই-ই কিশোরীচাঁদের 'কখন তোমাকে অনাদর করেছি কি'-র প্রশ্নে এই মেয়ের পক্ষেই বলা সম্ভব হয় 'অনাদর কখন করো নাই বটে, কিন্তু আমিও অনাদরের কর্ম্ম কখন করিই নাই।' এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান কৈলাসবাসিনীর 'আত্ম'অর্জন। যদিও একথা ঠিক কিশোরীচাঁদের সাহচর্য ও প্রেম ব্যতীত কৈলাসবাসিনীর এই উত্তরণ হয়ত কখনো সম্পূর্ণ হোত না, তা তিনি নিজেও জানতেন আর সে কারণেই দ্বিতীয়বার কাশী যাওয়ার পথে লক্ষ্মীমণির সঙ্গে আলাপ হলে তাঁর জন্য বেদনা অনুভব করেন কৈলাসবাসিনী। লক্ষ্মীমণি সম্পর্কে তিনি লেখেন,

> '...তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি বড় ভাল আর মন বড় ভাল। তিনি জদি নব্য বাবুদের হাতে পড়িতেন, তা হলে তা হলে অদ্বিতীয় স্ত্রীলোক হতেন। কিন্তু কপালক্রমে প্রাচীন স্বামীর হাতে পড়েছিলেন।...এই দুঃখু জে তিনি কোন সৎ বিদ্যানের হাতে পড়েন নাই। জ্যেমন এক একটা বিচি অমনি পড়ে গাচ হয়- হয়ে তাহাতে অনেক ফল হয় এর তাই হইয়াছে। আমাদের জে হওয়া তাহা অনেক যত্নে মাটির পাট করে জল দে হওয়া, কিছু আশ্চর্য্য নয়। আমার মন জেমন উর্ব্বরা, তখন অমন লোকের হাতে পড়িছি, এমন করে শিক্ষা দেছেন, তন্য তন্য করে বুঝায়ে দেছেন, তাহা শুনে নিতান্ত মুখ্যুরও জ্ঞান হয়...।'(১৪)

কৈলাসবাসিনীর ডায়েরী শেষ হয়েছে কিশোরীচাঁদের দেহান্তের সংবাদে...

> 'আজ আমার জিবোন শেষ হইল। ...আমি ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিলুম। আমার জিবন থাকিতেও মৃত্যু হইল। সকল সুকের শেষ করিলাম কাসি মিত্রের ঘাটে।' (১৫)

স্বামীর ছায়ায় বেড়ে ওঠা কৈলাসবাসিনীর পুরো জীবনই ছিল কিশোরীচাঁদ কেন্দ্রিক। নিজের জীবন ও তাঁর মূল্যবোধ সম্পর্কে তিনি যা অনুভব করেছেন তা কিশোরীচাঁদের থেকে পাওয়া কিন্তু সেই অনুভবকে উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করেছেন তিনি নিজে। সম্পূর্ন আত্মকথা জুড়ে তাঁর যে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা চোখে পড়ে তা কিশোরীচাঁদের 'গড়ে তোলা' ও স্বয়ং কৈলাসবাসিনীর নিজের 'হয়ে ওঠা'রই ফসল। এই ব্যক্তিত্বকে কুর্নিশ জানিয়েছিলেন স্বয়ং কিশোরীচাঁদও। তাঁর স্ত্রী যে তাঁর থেকে বেশি সাহসী, বেশি বুদ্ধিমান এবং অধিক সহ্যগুণসম্পন্ন তা অনুভব করে গর্বের সঙ্গে তা উচ্চারণ করেছিলেন কিশোরীচাঁদ আর এখানেই ঊনবিংশ শতকের 'নতুন' পরিবারভাবনার নির্মিতি। পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী রাসসুন্দরীরা পাখা ঝাপটাচ্ছিলেন, খুঁজছিলেন মুক্ত বাতাস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বদ্ধ পিঞ্জরের শিকলগুলো সামান্য হলেও আলগা হচ্ছিল, আলগা করছিলেন কিশোরীচাঁদ-কৈলাসবাসিনীরা। তাঁরা হয়তো অনেকটা পারেননি, কিন্তু কিছুটা পেরেছিলেন, যে কিছুটার পথ ধরে পরবর্তীতে আরও অনেকটা পারার পথ নির্মাণ হয়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. ঘোষ, মন্মথনাথ. কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র. কলিকাতা: শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত. ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ. পৃ.১১-৪৩

২. বিশ্বাস, অহনা ও ঘোষ, প্রসূন (সম্পা). অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি (২য় খণ্ড). কলকাতা: গাঙচিল. জুলাই ২০১৬ (২য় মুদ্রণ). পৃ.৮৫

৩. নিয়োগী, গৌতম (সম্পা). দুটি জীবনকথা সারদাসুন্দরী দেবী শরৎকুমারী দেবী. কলকাতা: অবভাস. সেপ্টেম্বর ২০২২ (প্রথম প্রকাশ). পৃ. ১৯

৪. মিত্র, প্যারীচাঁদ. আধ্যাত্মিকা. কলিকাতা: শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং. সন ১২৮৬. পৃ. Preface-i. বিশ্বাস, অহনা ও ঘোষ, প্রসূন (সম্পা). অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি (২য় খণ্ড). কলকাতা: গাঙচিল. জুলাই ২০১৬ (২য় মুদ্রণ). পৃ.৮৫
৫. তদেব
৬. ঘোষ, বিনয়. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা. কলকাতা: দীপ প্রকাশন. অক্টোবর ২০২০ (পরিমার্জিত দীপ সংস্করণ). পৃ.২২১-২২২
৭. ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা). রাসসুন্দরী দাসী আমার জীবন. নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া. ২০১১ (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ). পৃ. ৩০
৮. বিশ্বাস, অহনা ও ঘোষ, প্রসূন (সম্পা). অন্দরের ইতিহাস নারীর জবানবন্দি (২য় খণ্ড). কলকাতা: গাঙচিল. জুলাই ২০১৬ (২য় মুদ্রণ). পৃ.৮৫
৯. তদেব, পৃ.৮৬
১০. তদেব, পৃ.৯৫
১১. তদেব, পৃ.৯৬-৯৭
১২. তদেব, পৃ.১০৮
১৩. তদেব, পৃ.১১৭-১১৯
১৪. তদেব, পৃ.১২২
১৫. তদেব, পৃ.১২৮